

চিত্রকর

BANGLADARSHIAN.COM
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥চিত্রকর॥

ময়মনসিংহ ইন্সকুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে আমাদের গোবিন্দ এক কলকাতায়। বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু, সব চেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, 'পয়সা করবই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে।' সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খুব-একটা দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে-যাওয়া মলিন-হয়ে-যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রূপেয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পক্ষে আবিল হতে হতে আজ গোবিন্দ তার পয়সাপ্রবাহিণীর প্রশস্তধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পৌঁচেছে। গানিব্যাগুওয়ালা বড়োসাহেব ম্যাক্‌ডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্‌দুলাল।

গোবিন্দর পৈতৃব্য ভাই মুকুন্দ যখন উকিল-লীলা সংবরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছু জমা টাকা রেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সঙ্গে কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং তার পরিবারে অন্তর্ভুক্তের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভর করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মুকুন্দদাদার উইল-অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দর 'পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে ভ্রাতৃপুত্রের কানে মন্ত্র দিলে—'পয়সা করো।'

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পষ্ট কথায় তিনি কিছু বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশুকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। ফুল ফল পাতা দিয়ে, খাবারের জিনিস নিয়ে, কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস-ফলসার রস-জবার রস-শিউলিঝাঁটার রস দিয়ে নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যিক জিনিস-রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে। কেননা, যা অদরকারি, যা অকারণ, তার বেগ আশ্রয়ের আকস্মিক বন্যাধারার মতো—সচলতা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে—জ্ঞাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সত্যবতী ভুলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, এক তাল মাটি চ'টকে বেলা কাটছে। জ্ঞাতিরা বললে, বড়ো অহংকার! সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন। আর্ট শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটাখোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী অনাবশ্যিক খেয়ালে অযথা সময় নষ্ট করেন, এটা

দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভুত একটা আত্মবিরোধ ছিল—ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না বললেই হয়। পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বহিত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত; অনুগত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাভ্য করতে পারতেন না। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ বা সেবা নিয়ে পরিজনদের 'পরে কোনোদিন অযথা দাবি করেন নি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ করলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেন্সিল, কিনে এনে সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্ধুকটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন, “বা, এ তো বড়ো সুন্দর হয়েছে।” একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধ'রে তার পা দুটোকে পাখির মুণ্ড ব'লে স্থির করলেন; বললেন, “সতু, এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই—বকের ছবি যা হয়েছে চমৎকার!” মুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনায় ছেলেমানুষি কল্পনা ক'রে মনে মনে যে রসটুকু পেতেন, স্ত্রীও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রশয়, আশা করতে পারতেন না; শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অদ্ভুত অত্যাচার করতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোখের জল সামলাতে পারতেন না।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বুঝেছিলেন যে, তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকোও পার হয়ে যাবে। এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তাঁর ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়লেন গোবিন্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন, সর্বাগ্রে এবং সকলের উপরে পয়সা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল যে, সত্যবতী লজ্জায় কুণ্ঠিত হত।

তবু নানা আকারে আহারে-ব্যবহারে পয়সার সাধনা চলল। তা নিয়ে কথায় কথায় আলোচনা না ক'রে তার উপরে যদি একটা আক্রমণ থাকত তা হলে ক্ষতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব করা হয়—কিন্তু, সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না; কেননা, যে চিত্তভাব সুকুমার, যার মধ্যে একটি অসামান্য মর্যাদা আছে, সে'ই সব চেয়ে অরক্ষিত; তাকে আঘাত করা, বিদ্রূপ করা, সাধারণ রূঢ়ভাবে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চার জন্যে কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যিক। এতকাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন, সেজন্যে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয় নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই-সমস্ত অনাবশ্যিক সামগ্রী, ব্যয়ের ফর্দে ধ'রে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনাতেন। যা-কিছু কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ ক'রে। ভর্ৎসনার ভয়ে নয়, অরসিকের

দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্প-রচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগুলো অতিক্রম ক’রে দেয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশুর চিত্তকে প্রলুব্ধ করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন যতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে যেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ; যে-সব জন্তুর মূর্তি হত বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি-বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে, এমন-কি মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমস্ত সৃষ্টিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না-বড়োবাবু ফিরে আসবার পূর্বেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হল না।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণ স্বরূপে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ, দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অদ্ভুতত্ব নিয়ে খুব অউহাসি জমালে। তারা যেরকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্বেষের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট হিসাবে ফাঁকি-এমন-কি, তার টেকনিকে সুস্পষ্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্তমানে এলেন তাঁর মামির বাড়িতে। দ্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন, দেখলেন, মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঙ্গলাল বললেন, “এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্টি মূর্তি তাজা বেরিয়েছে-এর মধ্যে দাগা-বুলোনোর তো কোনো লক্ষণ নেই যে বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগুলো বের ক’রে আমাকে দেখাও।”

কোথা থেকে বের করবে। যে গুণী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীর্তিগুলোও সেইখানেই গেছে। রঙ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মামিকে বললেন, “এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।”

বড়োবাবু এখনো আসেন নি। সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন, বৃষ্টি পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন যায় না। আজ চুনিবাবু নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল, হাঁ ক’রে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো

ভাব; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে ব'লে বোধ হচ্ছে—কিন্তু, মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগুলোকে ‘ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ’ বললে অত্যাুক্তি করা হবে। এ কথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে, এইরকমের নৌকো যদি গড়া হয় তা হলে ইন্সুয়োরেস আপিস কিছুতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করছেন আর ঘরের ঐ মস্ত-চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেয়াল ছিল না যে, দরজা খোলা। বড়োবাবু এলেন। গর্জন ক’রে উঠলেন, “কী হচ্ছে রে!”

ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল, মুখ হল ফ্যাকাশে। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হচ্ছে তার কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরো প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন, তাতে তিনি আরো অবাক—এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো। ছবিটা কুটিকুটি ক’রে ছিঁড়ে ফেললেন। চুনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন। সেইখান থেকে ছেলের কান্না শুনে ছুটে এলেন। ছবির ছিন্ন খণ্ডগুলো মেঝের উপর লুটোচ্ছে আর মেঝের উপর লুটোচ্ছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভুলের আদি কারণগুলো সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এরই পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, “কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে।”

গোবিন্দ বললেন, “পড়াশুনো করবে না? আখেরে ওর হবে কী?”

সত্যবতী বললেন, “আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারও গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মায়ের আশীর্বাদ।”

গোবিন্দ বললেন, “আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছুতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিং-স্কুলে পাঠিয়ে দেব—নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।”

বড়োবাবু আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নামল, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে।

সত্যবতী চুনির হাত ধরে বললেন, “চল, বাবা।”

চুনি বললে, “কোথায় যাবে, মা।”

“এখান থেকে বেরিয়ে যাই।”

রঙ্গলালের দরজায় এক-হাঁটু জল। সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন; বললেন, “বাবা, তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও এ’কে পয়সার সাধনা থেকে।”

কার্তিক ১৩৩৬

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM